ভূমিকা

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী।
কত-না বর্ণে কত-না স্বর্ণে গঠিত,
কত-যে ছন্দে কত সংগীতে রটিত,
কত না গ্রন্থে কত-না কণ্ঠে পঠিত
তব অসংখ্য কাহিনী!"[১]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিভূত হয়েছিলেন জগতের বিচিত্র রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ অনুভব করে। বিশ্বরহস্য উন্মোচনে তিনি সদাসর্বদা একাগ্র চিত্ত হয়ে নিজস্ব সৃষ্টির সম্ভার উপহার দিয়েছেন। বিশ্বরহস্য উন্মোচনের উদ্দেশ্যেই শিল্প-সাহিত্য বা সৃজনশীল ধর্মের প্রকাশ। ব্যক্তিমানুষের হাতেই কত বিচিত্র পন্থায় বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্য প্রকাশিত হয়। সাহিত্য সৃজন তার মধ্যে অন্যতম। সৃষ্টিশীল ব্যক্তির হাতে সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে আমরা নতুন নতুন রস-আস্বাদন করে থাকি। আদিসাহিত্য কাব্য নিজের পথ পরিক্রমায় একে একে নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্পকে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে। সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে কাব্য সাহিত্য নিজের বিস্তৃতি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বজায় রাখলেও গদ্য সাহিত্য একসময় নিজের জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। বিশ্ব-সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও গদ্য এলো বিলম্বিত লয়ে। গদ্যের ওপর ভর করে উপন্যাস নিজের ডানা মেলেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে।

উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম এবং প্রধান আধার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। বাংলা সাহিত্য-শাখায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যাত্রা উনিশ শতকে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ফল। তারই হাত ধরে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাব। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য বহু নতুন শাখার জন্ম দেয়। প্রতিটি শাখাই এক অভিনব রূপ নিয়ে নিজেদের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছে। উপন্যাস নাম নিয়ে এক অভিনব শাখা পাঠক মহলে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। তবে একদিনে নয়, ভিতরে ভিতরে তার প্রস্তুতিপর্ব ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮খ্রি:)-এ চেষ্টা করেছেন উপন্যাস সাহিত্যের একটা রূপ দিতে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সার্বিক রূপ সে সময়ের সমাজে সেভাবে প্রত্যক্ষ হয়নি বলে উপন্যাসটি তার যথার্থ মর্যাদা লাভ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একে দিলেন বিস্তৃত এবং পরিপূর্ণ রূপ। প্রথম পর্বে ঐতিহাসিকতা, রোমান্স, সামাজিকতাকে পাথেয়

করে উপন্যাসের পথচলা শুরু হলেও পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে মনস্তত্ত্বও তার জায়গা দখল করে নিয়েছিল।

উপন্যাস রচনার হাতেখড়ি পর্বের পূর্বে বহু সাহিত্য শাখায় উপন্যাসের পূর্বসূত্র সূচিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রি:)-র মধ্যে তাঁর যথার্থ সৃজনশীলতার পরিচয়। তাঁর 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩ খ্রি:), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮ খ্রি:) যেমন সামাজিক দিকের প্রতি দৃষ্টি দেয় তেমনি 'রাজসিংহ' (১৮৮২ খ্রি:), 'আনন্দ মঠ' (১৮৮২ খ্রি:), 'সীতারাম' (১৮৮৭ খ্রি:) রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিকতার মধ্য দিয়ে অন্যমাত্রা যোগ করে। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬ খ্রি:) বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য সৃষ্টি। নারীর স্বাধীনচেতা মনোভাব এই উপন্যাসে তিনি তুলে ধরলেন। নবকুমারের মধ্যেও ভাবীকালের নায়কের রসদ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে সমাজ ধর্ম অন্যদিকে নীতিবাদী ভাবনা— এই দু'টিকে নিয়েই চলার চেষ্টা করেছেন। প্রমাণ হিসেবে কুন্দনন্দিনী এবং রোহিনীর উদাহরণই যথেষ্ট। তবে 'রজনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা অন্য। আসলে উপন্যাস রচনার প্রতিষ্ঠা পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। এই সময়পর্বে রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস জগতে নিজস্ব সৃষ্টি দিয়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের পর বাংলা উপন্যাস জগতে রবীন্দ্রনাথের হাতে এলো নতুন মুক্তি। প্রসঙ্গক্রমে আচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ের একটি বক্তব্য উপস্থাপন করা যায়—

> *"বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে গ্রহণ করিয়াছিলেন সমাজ-শাসনের ও নীতি-শিক্ষার অন্যতম উপায়রূপে, তাই তাঁহার রচনা উপদেশগূঢ়। রবীন্দ্রনাথ কখনো সাহিত্যকে সেভাবে দেখেন নাই। তাঁহার কাছে সাহিত্যের কাজ জীবন মননের ফসল ফলানো। এই জন্য সাহিত্য সেই সাধনা-সাপেক্ষ যে সাধনা কলম-পেষার অভ্যাস নয়, যে সাধনা কর্মের চিন্তার ও আনন্দের— এক কথায় সর্বাঙ্গীন জীবনের-সাধনা।"*[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নতুন আঙ্গিকে নবযুগের নির্মাণ করলেন 'চোখের বালি' (১৯০৩খ্রি:) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। 'গোরা' (১৯১০খ্রি:), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬খ্রি:), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬খ্রি:), 'যোগাযোগ' (১৯২৯খ্রি:), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯খ্রি:) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি উপন্যাস জগতে স্বকীয়তা নির্মাণ করলেন। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে তথাকথিত সমাজের আমজনতার কথা সাধারণভাবে অনুপস্থিত ছিল। সেই অভাব পূরণের ভার নিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব ১৯১৭ খ্রি:, ২য় পর্ব ১৯১৮ খ্রি:, ৩য় পর্ব ১৯২৭ খ্রি:, ৪র্থ পর্ব ১৯৩৩ খ্রি:),

'দেবদাস' (১৯১৭ খ্রি:), 'পথের দাবী' (১৯২৬ খ্রি:) প্রতিটি উপন্যাসের জনপ্রিয়তা তাঁকে শীর্ষে স্থান দেয়। শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে বিশ শতকের দুই দশকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর পাশাপাশি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অনুপমা দেবী, নিরুপমা দেবী, সীতাদেবী, শান্তাদেবী প্রমুখ লেখকেরা পারিবারিক উপন্যাসের পাশাপাশি নারী-পুরুষের প্রথাসিদ্ধ আদর্শের ন্যায়-অন্যায়ের বোধ দিয়ে মাপা পৃথিবীকে লেখনীর মধ্যে নিয়ে এলেন।

বিশ শতক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে এক নতুন উন্মাদনা নিয়ে উপস্থিত। বিশ্বজুড়েও এক নতুন অভিঘাত মানুষের স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধিকে দোলায়িত করে, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪ খ্রি:-১৯১৯ খ্রি:) নামে পরিচিত। দ্বিতীয় অভিঘাত আসার আগে পর্যন্ত বাঙালির চিন্তা-চেতনা- ভাবনায় জটিলতা দেখা দেয়। নাগরিক মধ্যবিত্তজীবন গড়ে ওঠে। সমাজের জটিল রোগকে সাঙ্গ করে সাহিত্য তার ধারায় নতুন ভাবনার সঞ্চার করল 'কল্লোল পত্রিকা' (১৯২৩ খ্রি:)-কে কেন্দ্র করে। উপন্যাস সাহিত্যে বিশ শতকে 'কল্লোলযুগ'-এর সাহিত্যিকদের রচিত উপন্যাস ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই যুগ চিরাচরিত ভারতীয় আদর্শের মনোভাবে কিছুটা আঘাত দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকরা এলেন। লেখা হল 'পাঁক', 'বেদে', 'কয়লাকুঠির দেশ'-এর মতো উপন্যাস।

বিশ শতকের তৃতীয় দশক বাংলা উপন্যাসের জগতে বিচিত্ররূপের প্রকাশ পায়। এই যুগের সূচনা পর্বে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস সেই পথ প্রশস্ত করল। এরপর জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু' (১৯৩১ খ্রি:), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চৈতালীঘূর্ণি' (১৯৩১ খ্রি:), অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' (১৯৩৫ খ্রি:) প্রকাশিত হয়। ১৯২৯-১৯৩৫ সালের মধ্যে লিখিত উপন্যাসে উঠে এসেছে বিচিত্র বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক অবস্থা থেকে বাঙালি জীবনের অন্দরমহল পর্যন্ত। এই সময় পর্বে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫ খ্রি:) বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নতুন রীতির উদ্ঘাটন করল। তৎসহ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬ খ্রি:) উপন্যাসে জীবনের মর্মমূলের রূপচিত্র ধরা পড়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬ খ্রি:)-তে ধনিক শ্রেণির শোষণের জ্বলন্ত চিত্র বর্তমান সাহিত্যে নতুন ধারা সূচিত করে।

বাংলা উপন্যাসের জগতে তিরিশের কালপর্বের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ প্রথাবিরোধী নতুন রীতির সূচনা এই সময়পর্বে উপন্যাসের দৃষ্টিকোণকে বদলে দিয়েছিল। কিছু সাহিত্য পত্রিকা যেমন— 'পরিচয়', 'পূর্বাশা', 'কবিতা', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'উত্তরা', 'বিচিত্রা'

পাঠককে যেমন একদিকে বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর পর্যায়ে উন্নীত করে তেমনি অন্য দিকে বিনোদনেরও মাধ্যম হয়ে উঠে। কিন্তু এই দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯ খ্রি:-১৯৪৫ খ্রি:) পরিস্থিতি পাঠককে সাধারণ মোহগ্রস্ত সাহিত্যের পাঠ থেকে বহুদূরে নিয়ে যায়। এই পর্বে প্রগতিশীল আর্থ-সামাজিক ভাবনার উদ্ভব হয়। বিশ শতকের দু'টি বিশ্বযুদ্ধ আসলে বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটে সংঘটিত। এই বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বের সমাজ ও সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। বিশ্বের বীভৎস রাজনৈতিক পরিবেশ সাধারণ মানুষের মর্মমূলকে কুৎসায় করেছিল ভারাক্রান্ত। চারিদিকে এক অবক্ষয়ের যুগ ঘনায়মান হয়েছিল। চল্লিশের কালপর্ব ভারতীয় জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ সময়। পরপর বহু আন্দোলন ভারতীয় জনমানসে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। সামাজিক-অর্থনৈতিক মন্দার বশবর্তী হয়ে সর্বহারার দলে পরিণত হয় সাধারণ জনস্রোত। বহু রক্তক্ষয়ের পর স্বাধীনতা আসে। স্বাধীনতার পরও বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সমাজকে। সমাজের এই পরিবর্তনই ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো ঔপন্যাসিকদের কলমে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় রূপ লাভ করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯ খ্রি:), 'গণদেবতা' (১৯৪২ খ্রি:), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' (১৯৪৪ খ্রি:), সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪ খ্রি:), সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' (১৯৪৫ খ্রি:), 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯ খ্রি:), বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর' (১৯৪৯ খ্রি:) উপন্যাসগুলি কালের পরিমাপক।

চল্লিশের দশকের মন্বন্তরের জীবন যন্ত্রণার কথা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' (১৯৪৪ খ্রি:), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংঙ্কেত' (১৯৫৯ খ্রি:), গোপাল হালদারের 'পঞ্চাশের পথ' (১৯৪৪ খ্রি:), 'তেরশ পঞ্চাশ' (১৯৪৫ খ্রি:), 'ঊনপঞ্চাশী' (১৯৪৬ খ্রি:) উপন্যাসে সুবিন্যস্ত আকারে রয়েছে। দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা বাংলা উপন্যাসের আর এক বাঁক বদলকে চিহ্নিত করে।

স্বাধীনতা-উত্তর-পর্বের বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের নতুন সঙ্কট, হতাশা, সংগ্রামের ইতিহাস উঠে এলো সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' (১৯৫০ খ্রি:), নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল' (১৯৫২খ্রি:), বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' (১৯৫২ খ্রি:), বিমল করের 'দেওয়াল' (১ম খণ্ড১৯৫৬ খ্রি:, ২য় খণ্ড১৯৫৬ খ্রি:, ৩য় খণ্ড১৯৫৮ খ্রি:, ৪র্থ খণ্ড ১৯৬২ খ্রি:) উপন্যাসে। সমরেশ বসুর 'বিটি রোডের ধারে' (১৯৫২ খ্রি:), 'শ্রীমতি কাফে' (১৯৫৩ খ্রি:), মূলত মূল্যবোধের সংকটাপন্ন চিত্রই ফুটে উঠেছে। এই ধারাতেই অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৫ খ্রি:), অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড়শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭ খ্রি:), প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' (১৯৫৭ খ্রি:),

কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' (১৯৫৯ খ্রি:) ইত্যাদি উপন্যাসে আঞ্চলিকতার বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সমাজের পিছিয়ে-পড়া মানুষদের অন্তর্বয়নকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিকেরা।

চল্লিশের দশকে উঠে আসা কিছু নারী ঔপন্যাসিক নিজেদের কথাবয়নে অভিনবত্বের পরিচয় রেখেছেন। তাঁরা পরবর্তীকালে সৃজনশীল ক্ষমতার দ্বারা বাংলা উপন্যাসের বাঁক বদলকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, কবিতা সিংহ, প্রতিভা বসু, লীলা মজুমদার উল্লেখযোগ্য। এই লেখিকাদের রচনায় যেমন বাঙালী নারীদের প্রগতিশীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল তেমনি ফুটে উঠেছে অন্দরমহলের কথা। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে আশাপূর্ণা দেবী এবং মহাশ্বেতা দেবী উভয়েই নিজস্ব প্রতিভাবলে বাংলা উপন্যাসের দিক বদলের নির্দেশক রূপে পরিচিতি লাভ করলেন। আশাপূর্ণা দেবী 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৫ খ্রি:), 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৬ খ্রি:), 'বকুল কথা' (১৯৭৩ খ্রি:) এবং সত্তরের দশকে মহাশ্বেতা দেবী 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৫ খ্রি:), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭ খ্রি:), 'অপারেশন বসাই টুডু' (১৯৭৮ খ্রি:) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ভিন্ন মাত্রাকে যোগ করলেন।

ষাট-সত্তরের দশকের খাদ্য আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, শিল্পায়নের দ্রুত প্রসার বাঙালি জীবনের চিরাচরিত রীতির আদর্শ বদল সমগ্র বিষয়ই বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ শুরু করল। কথাসাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার ছোটগল্প রচনার জগতে প্রবেশ করেন পঞ্চাশের দশকে। উপন্যাস সাহিত্যে ষাটের দশকে প্রবেশ করেছিলেন 'অন্তর্জলী যাত্রা' (১৯৬২ খ্রি:)-র মধ্য দিয়ে। তাঁর লেখা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নির্মাণ করলেন আলাদা জগৎ; যে জগতে তিনি একলা পথের পথিক। এই পর্বে একে একে উঠে এলেন— সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, জরাসন্ধ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিক। তাঁদের 'বিবর' (১৯৬৫ খ্রি:), 'বনপলাশীর পদাবলী' (১৯৬২ খ্রি:), 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১৯৭১ খ্রি:), 'তৃণভূমি' (১৯৭০ খ্রি:) উপন্যাসগুলিতে সমকালীন ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য, বিক্ষোভ ও পৃথিবীব্যাপী অসন্তোষ-বিদ্রোহের প্রতীকী চিত্র ধরা পড়েছে।

ষাট-সত্তর-আশির দশক ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবাংলার পক্ষে এক কঠিন সময়। এই পর্বে জাতীয় কংগ্রেস রাজনীতির মধ্যে ফাটল ধরে। শক্তিশালী হতে শুরু করে কমিউনিস্ট পার্টি। নকশাল বাড়িতে কৃষকদের ওপর অত্যাচারকে কেন্দ্র করে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে নকশাল আন্দোলন (১৯৬৭ খ্রি:)। 'সত্তর দশক মুক্তির দশক' শ্লোগান হিসেবে সারা বাংলাকে প্রভাবিত

করে। রাজনৈতিক অবস্থা এক ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্মুখীন হয়। ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির রূপ পরিবর্তিত হল ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে বামফ্রন্ট সরকারের বিপুলভোটে জয়লাভের মধ্য দিয়ে। জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। পশ্চিমবঙ্গে শুরু হল নতুন অধ্যায়। ডান-বাম দুই পক্ষের রাজনৈতিক বলয়ে ব্যক্তিজীবন দোলাচলতায় নিমজ্জিত হয়। ১৯৮০ সাল অর্থাৎ আশির দশক থেকে শুরু হল রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সাফল্য ও পরাজয়ের হিসেব নিকেশ। সাহিত্যের পাতায়ও উঠে এল নতুনের ছোঁয়া। সৃষ্টি হল কিছু কালজয়ী সাহিত্য। উপন্যাসের পাতায়ও এলো নতুনের পালক।

আশি-নব্বইয়ের দশকে বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার ছোঁয়া এসে উপস্থিত হয়। প্রাচীন বিশ্বাসকে ভেঙে নতুনের সংযোগে বাংলা উপন্যাসের মোড় বদল হয়। প্রফুল্ল রায়ের 'আকাশের নিচে মানুষ' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম' (১ম খণ্ড ১৯৮৮ খ্রি:, ২য় খণ্ড ১৯৮৯ খ্রি:), আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৯৩ খ্রি:), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'মানবজমিন' (১৯৮৮ খ্রি:), 'অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫ খ্রি:), বুদ্ধদেব গুহর 'একটু উষ্ণতার জন্য' (১৯৮৬ খ্রি:), মতি নন্দীর 'সাদা খাম' (১৯৯০ খ্রি:) উপন্যাসগুলি চিরাচরিত উপন্যাসের ঢঙে না গিয়ে যোগ করল নতুন দৃষ্টিকোণ। মূলত আশির দশকে উঠে আসা ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় তাঁর 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮ খ্রি:) উপন্যাসেই জাত চিনিয়ে দিয়েছিলেন। তবে নব্বইয়ের দশকে প্রকাশিত বেশিরভাগ উপন্যাসে তিনি প্রচলিত রীতির ছক ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়েছেন। সময়, সমাজ, ইতিহাসের বৃত্তে মানুষের জীবনানুসন্ধান দেবেশ রায়ের লক্ষ্য। ফলে নতুন বৃত্ত রচনায় তিনি সফল হয়েছেন। এই দশকেই সুচিত্রা ভট্টাচার্য, বাণী বসু, দিব্যেন্দু পালিত, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, আবুল বাশার, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, আফসার আহমেদ, সমরেশ মজুমদার, তিলোত্তমা মজুমদার, নলিনী বেরার মতো ঔপন্যাসিকেরা উঠে এলেন। নব্বইয়ের দশকেই ঔপন্যাসিক সত্তা নিয়ে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বহিঃপ্রকাশ। আশির দশক থেকে তাঁর লেখালেখির হাতেখড়ি হয় গল্পসাহিত্যের মধ্য দিয়ে। এতদিন তিনি সঞ্চয় করেছেন বহু অভিজ্ঞতা। আর এই অভিজ্ঞতাকেই রূপ দিলেন উপন্যাসে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসের পটভূমি ধীরে ধীরে গড়ে উঠতেই পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয় তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী' (১৯৯২ খ্রি:); শুরু হয় তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার যাত্রা। কর্মজগতের অভিজ্ঞতা এবং একজন অভিজ্ঞ সমাজ পর্যবেক্ষক হিসেবে তাঁর বিশ্লেষণী শক্তি পরবর্তীকালে উপন্যাসগুলির দেহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিরাজ করছে। তিনি তুলে এনেছেন ভারতবর্ষের

দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস-রাজনীতি- সামাজিক রূপ পরিবর্তনের দলিলকে। বাঙালী জীবন-চর্যার রূপ পরিবর্তনের চিত্রকেও তিনি বাদ দেননি। বিভিন্ন ভাবে সমাজ এবং ব্যক্তি চরিত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়াকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে তার বহিঃপ্রকাশ করেছেন উপন্যাসের মধ্যে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী কীভাবে একজন সমাজ গবেষকের ভূমিকা পালন করে দীর্ঘ সময়ের সামাজিক ইতিহাসকে ধরতে গিয়ে জীবন জিজ্ঞাসার ভিন্ন স্তরকে তুলে ধরেছেন সেই বিষয়টি অনুধাবনই আমার গবেষণা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ১৮টি উপন্যাস নিয়ে আমি আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। উপন্যাসগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ধরনের মানুষের জীবনদর্শনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য গবেষণা কর্মে চরিত্রের আত্মানুসন্ধানের স্বরূপকে আমি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভাজন করেছি।

প্রথম অধ্যায় : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর জীবন ও সাহিত্য পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায় : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস সাহিত্যের প্রাথমিক পরিচয় ও পর্ব বিভাজন

তৃতীয় অধ্যায় : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম পর্বের উপন্যাস (১৯৯০-১৯৯৯) : জীবন জিজ্ঞাসার ভিন্ন স্বর অনুসন্ধান

চতুর্থ অধ্যায় : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস (২০০০-২০০৯): জীবন জিজ্ঞাসার ভিন্ন স্বর অনুসন্ধান

পঞ্চম অধ্যায় : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর তৃতীয় পর্বের উপন্যাস (২০১০-২০১৯): জীবন জিজ্ঞাসার ভিন্ন স্বর অনুসন্ধান

ষষ্ঠ অধ্যায় : সমকালের প্রেক্ষিতে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর স্বাতন্ত্র্য

আমার গবেষণা কর্মে উক্ত অধ্যায়গুলির শিরোনামের দিকে লক্ষ রেখে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ঔপন্যাসিক সত্তার অনুসন্ধানে অগ্রসর হব। আমার গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সাহিত্যিক সত্তার অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তৎসহ বাংলা উপন্যাস জগতে তিনি যে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিলেন সে বিষয়টিও স্পষ্ট হবে। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী মানব চরিত্রের ভিন্ন স্বরকে কীভাবে অনুসন্ধান করেছেন তা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

তথ্যসূত্র:

১. ‘চিত্র’ (নামকবিতা, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩০২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩০২, কাব্যগ্রন্থ সংস্করণ, ১৩২২, শেষতম পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪২৪, পৃ. ১১।

২. ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৪৫ বেণিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৮, ষষ্ঠ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ. ৯।

.